ছন্দের টুং টাং

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৫৯
প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী অলংকরণ সুনির্মল বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব
কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস
প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

ছন্দের টুং টাং

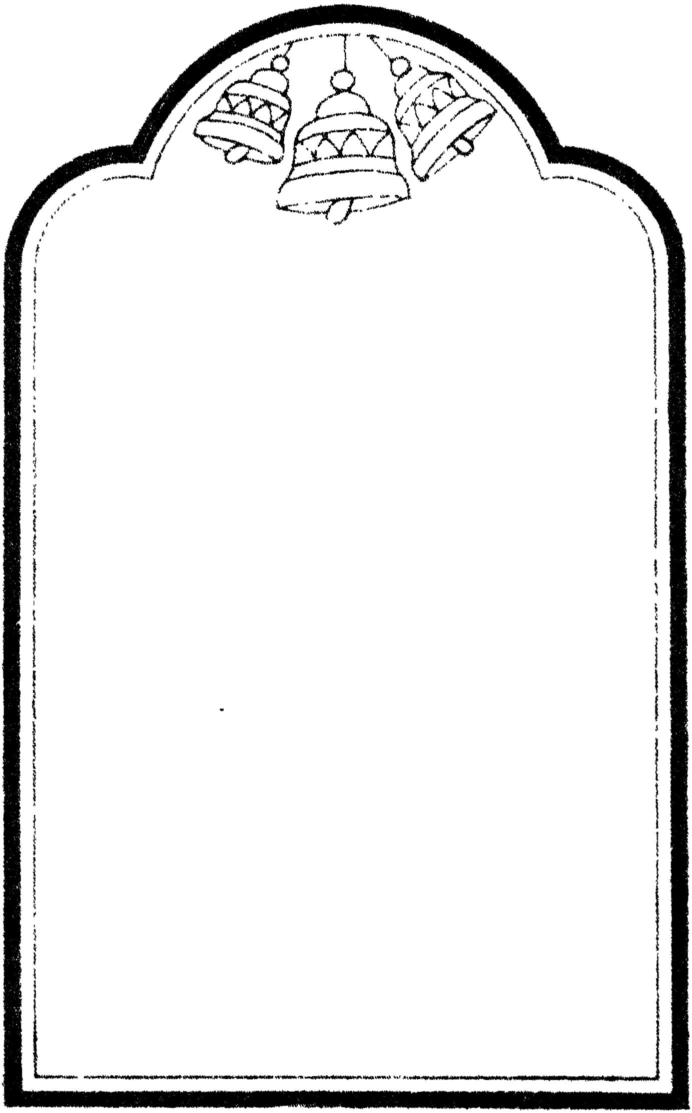
সুনির্মল বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে
আনন্দ-উপহার

প্রকাশকের নিবেদন

'ছন্দের টুং টাং' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘকাল আগে। বইটি বহুকাল যাবৎ সম্পূর্ণরূপে দুষ্প্রাপ্য। সুনির্মল বসুর গ্রন্থাবলীতেও 'ছন্দের টুং টাং' নেই। বহু চেষ্টা করে একটিমাত্র কপি জোগাড় করা গিয়েছে। মূল বইয়ের প্রতিটি অক্ষর এবং লেখকের নিজের হাতে আঁকা প্রতিটি ছবি অবিকৃত রেখে নতুন চেহারায় তুলে দেওয়া হল পাঠকের হাতে।



ছেলেদের ছন্দ

তোমরা সকলেই বোধহয় কবিতা পড়তে ভালোবাস। নানান্ গন্ধের ফুল যেমন তোমাদের প্রাণমন মাতিয়ে তোলে, তেমনি নানান্ ছন্দের, নানান্ ভাবের কবিতা পড়েও তোমরা নিশ্চয়ই খুব খুশী হও। নয় কি?

ছন্দ কোথায় নেই?—গাড়ীর যাওয়া-আসার শব্দে, মানুষের কথাবার্ত্তায়, ফেরী-ওয়ালার ডাক-হাঁকে, পশুদের চীৎকারে, পাখীদের গানে, ভোমরার গুঞ্জনে, নদীর কল্লোলে,—পাতার মর্ম্মর-ধ্বনিতে—সবার

ভিতরেই বিভিন্ন ছন্দ বাঁধা আছে। এ সব ছন্দ আবার কবিতায় সুন্দরভাবে ধরা যেতে পারে। আজ তোমাদের কয়েকটি নতুন ধরণের মজার ছন্দের নমুনা দেব।

ষ্টেশনে গাড়ী থেমেছে, অমনি খাবার-ওয়ালারা চীৎকার করে' উঠ্‌ল—

'পুরী-মিঠাই',—

'গরম চা—চা গরম'

এই ছন্দ এখন কবিতায় ধরা যাক্—

পুরী-মিঠাই

পুরী-মিঠাই—
আরো কি চাই ?
বাবু দেখুন্
ভাবেন্ কি ছাই ?

ছন্দের টুং টাং

কিনে ফেলুন্
গরম গরম্,—



খেয়ে দেখুন্,
কেমন নরম !
বসে' কেবল
ভাবেন বৃথাই—

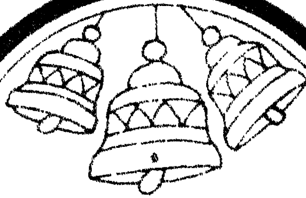
ছন্দের টুং টাং

পুরী-মিঠাই
পুরী-মিঠাই।

গরম চা—চা গরম
গরম চা—চা গরম—
সহিত তার কেক্ নরম—
নেবেন তো—নিন্ না ছাই,
সময় আর নাইরে নাই।

সহরের রাস্তায় অলিতে গলিতে ফেরী-ওয়ালা চীৎকার করে' যাচ্ছে—
'মালাই বরফ্', 'চুড়ী চাই'

মালাই বরফ্
মালাই বরফ্!
খেয়েই দেখুন—

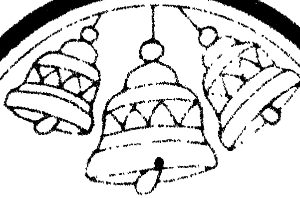


ছন্দের টুং টাং

কেমন সোয়াদ্,
আরও কি গুণ!
এমন মালাই
কোথায় পাবেন?
বারেক খেলেই
আবার খাবেন—
বরফ বেচেই
আমার গরব—
মালাই বরফ
মালাই বরফ।

-

চুড়ী চাই
চুড়ী চাই
চুড়ী চাই—



ছন্দের টুং টাং

সারাদিন
হেঁকে যাই,
কোনো পথ
বাকি নাই—
চুড়ী চাই
চুড়ী চাই!

ঐ যে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে একটি গরীবের ছেলে ভিক্ষা করছে—'একটি পয়সা —দে মা!' এখন এটাকে ছন্দে ধরা যাক্,—

একটি পয়সা দে মা

একটি পয়সা দে মা,
মুখটি শুক্‌নো যে মা,
খাইনি আজ্‌কে যে গো,
একটি পয়সা দে গো!

ছন্দের টুং টাং

অন্ধ দুঃখী ছেলে
দ্যাখ্‌না চক্ষু মেলে,



আর তো পার্‌ছি নে মা—
একটি পয়সা দে মা!

'ম্যাচ্‌' জিতে একদল ছেলে ভীষণ হল্লা করে বাড়ী ফির্‌ছে—'হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে—।"

ছন্দের টুং টাং

ছন্দে ধরা যাক্—

হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে

হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে—

বুক্ দুর্ দুর্ রে—

উল্লাস চীৎকার

উৎকট সুর্‌রে।

আজ আর কাজ নয়

রাস্তায় ঘুর্‌রে—

হিপ্ হিপ্ হুর্ রে।

রাস্তা দিয়ে একদল লোক একটি মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে চলেছে—'বল হরি—হরি বোল্।' ছন্দে ধরা গেল—

বল হরি হরিবোল্

বল হরি—হরি বোল্,

মরে গেছে—খাটে তোল্।

ছন্দের টুং টাং

চল ত্বরা—শ্মশানেই
মরে গেলে—দশা এই।
দুনিয়াতে—যারা ভাই
বেঁচে থেকে—করে জাঁক
তাহাদেরে—ডেকে আন্—
এসে তারা—দেখে যাক্।
মরে গেলে—সকলেই
শ্মশানে কি—কবরেই
যাবে, এতে—নাহি গোল্
বল হরি—হরি বোল্।

ঝমাঝম্ বৃষ্টি হচ্ছে। নালার জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে—পাড়ার ফ্যালা সুর করে' গান ধরেছে—

ছন্দের টুং টাং

আয় বৃষ্টি হেনে
আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগ্ কাট্‌ব মেনে,
মেঘ গর্জ্জে ডাকে
ভেক্ তর্জ্জে হাঁকে।
গাছ কাঁপ্‌ছে ঝড়ে
বুক্ কাঁপ্‌ছে ডরে!

একদল লোক একটা ভারী জিনিষ তুল্‌ছে আর চীৎকার করছে—'হেঁইয়ো হো'। এটাকে ছন্দে রূপ দেওয়া যাক্—

হেঁইয়ো হো
হেঁইয়ো হো
চুপ্ রহো—

ছন্দের টুং টাং

বাঃ সাবাস্,
বাস্‌রে বাস ।
মর্দ্দ কে
সজ্জ রে ?
করতে কাজ
নয়ক আজ
হদ্দ যে,—
মর্দ্দ সে ।

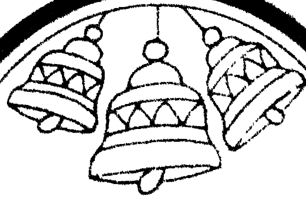
সন্ধ্যা হয়ে গেছে—দূরের শাল-বনে
শেয়াল ডেকে উঠ্‌ল—'হুক্কা হুয়া ।'

হুক্কা হুয়া
হুক্কা হুয়া
শব্দ শোনো—

বন্-কিনারে
ওই এখনো।



'হুক্কা হুয়া'
'হুক্কা হুয়া'
জানছ কি গো
বল্‌ছে উহা ?



ছন্দের টুং টাং

বল্‌ছে ডেকে
ঝোপ্‌টি থেকে,
বিশ্বে নাকি
সবই ভুয়া—
হুকা হুয়া
হুক্কা হুয়া।

এখন, বিদেশী ছন্দ বাংলায় কেমন সুন্দর করে ধরা যায় তার নমুনা দেখ—

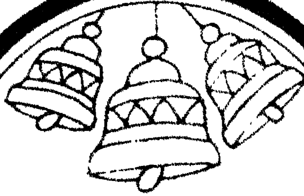
Half a league, half a league
Half a league, onward—

চল্‌ রে চল্‌, চল্‌ রে চল্‌
চল্‌ রে চল, সম্মুখেই—

কিম্বা—

Twinkle, twinkle, little star—
চঞ্চল, চঞ্চল, তারার সার।

এ-রকম অনেক ছন্দই বাংলায় হতে পারে। আরো নতুন নতুন ছন্দের নমুনা বইখানিতে তোমরা পাবে।



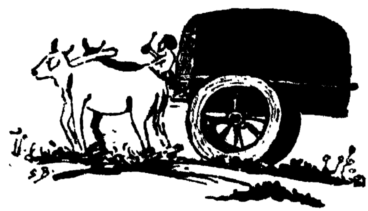
ছন্দের টুং টাং

শান্ত দুপুর। রাঙ্গা মাটির পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে—ঐ দূরের নীল জংলা পাহাড়টার কোলে; একটা গরুর গাড়ী চলেছে ঐ পথ ধরে' ধীরে ধীরে।—একঘেয়ে আওয়াজ কানে আস্ছে—"ক্যাঁচোর কোঁচ্, ক্যাঁচোর কোঁচ।" আওয়াজটাকে ছন্দে ধরা গেল।—

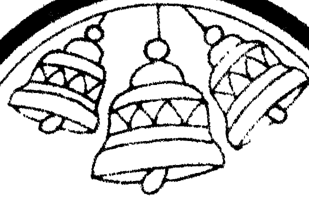
ক্যাঁচোর কোঁচ
ক্যাঁচোর কোঁচ্—
ক্যাঁচোর কোঁচ্—

ছন্দের টুং টাং

পথের ধার
আওয়াজ রোজ ;
চালক ঠায়
তামাক খায়,
তাকায় ওই
পাকায় মোচ্ ।



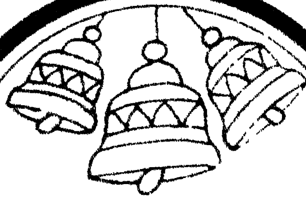
গরুর গায়
কেবল, হায়



ছন্দের টুং টাং

লাগায় জোর
লাঠির খোঁচ্।
বলদ্ গাই
কাতর তাই,
দ্যাখায় ফের
ভুরুর ঘোঁচ্।
ক্যাঁচোর কোঁচ্
ক্যাঁচোর কোঁচ্।

দূরের একটা-পোড়ো বাড়ীর খোড়ো চালে করুণ সুরে একটা পায়রা ডেকে হয়রান্ —"বক্ বকম্ বক্।" ও কি বল্ছে কে জানে! যাই-হোক্ আমাদের ছন্দের আর একটি খোরাক্ জুট্লো।



ছন্দের টুং টাং

বক্ বকম্ বক্
বক্ বকম্ বক্
বক্ বকম্ বক্,
দ্যাখ্—রকম দ্যাখ্
দূর চালায় এক—
কোন্ পাখীর আজ
প্রাণ উতল্ ভাই.
ওই শীতল ছায়
গান্ শুনায় তাই।
কোন্ পাখীর আজ
গান্ গাবার সখ্—
বক্ বকম্ বক্।

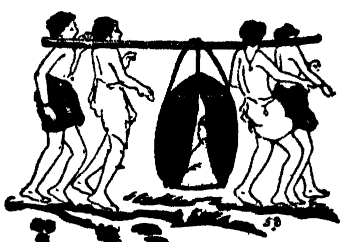
—"হুঁই দাব্ড়ে, হুকুম দাব্ড়ে"—ও
আবার কি? মেঠো রাস্তা ধরে' একটা পাল্কী

ছন্দের টুং টাং

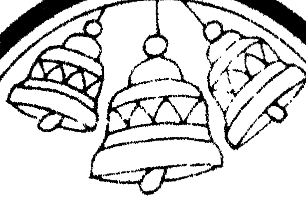
এদিকে আস্‌ছে। চলার তালে তালে ছড়া বল্‌ছে। উড়ে বাহকদের ছড়াগুলি কি অদ্ভুত। তা হোক্‌ না—পদ্যে ধরা যাক্‌।

হুঁই দাব্‌ড়ে

হুঁই দাব্‌ড়ে   হুকুম্‌ দাব্‌ড়ে,
বাপ্‌ আজ্‌ কি   রোদের তাপ্‌রে



চল্‌ ভাইয়া   কিসের ভয় রে ?
বল ভাইয়া—   মোদের জয় রে।



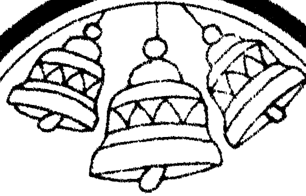
ছন্দের টুং টাং

চল্ আজ্‌কে তুরগ্ ছন্দে
নয় নাম্‌বে আঁধার সন্ধ্যে।
পথ্ মস্ত অনেক দীর্ঘ
ফ্যাল্ ফ্যাল্ রে চরণ শীঘ্র।
রোয় বউটি কপাল্ চাপ্‌ড়ে।
হুঁই দাব্‌ড়ে হুকুম দাব্‌ড়ে।

—"হাম্বা"—

বুধী গাইটার বাছুরটা অমন স্বরে ডাক্‌ছে কেন? নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পেয়েছে,—'ওরে পট্‌লা শীগ্‌গির এক বাল্‌তী জল নিয়ে আয় তো!'—এই সুযোগে একটা ছন্দ করে ফ্যালা যাক্।

হাম্বা হাম্বা
হাম্বা হাম্বা
ডাক্‌ছে বাচ্চা।
ঝ'র্‌ছে ঘাম্ বা।



ছন্দের টুং টাং

শোন্‌রে শোন্‌রে
যায় রে প্রাণ্‌ বা।
হাম্বা—হাম্বা।

তেঁতুল গাছে শীতল বাতাসের মাতামাতি। হঠাৎ গাছের উপর—"কোয়াক্‌ কোয়াক্‌ কোয়াক্‌।" কে বাপু তুমি! নাম নেই ধাম্‌ নেই—হঠাৎ বাজখাঁই আলাপ্‌। তোমার সুরের ছন্দটা মন্দ নয়—এসো ছন্দে তোমার সঙ্গে আলাপ্‌ করা যা'ক্‌।

কোয়াক্‌ কোয়াক্‌ কোয়াক্‌
কোয়াক্‌ কোয়াক্‌ কোয়াক্‌,
নীরব নিঝুম্‌ দুপুর,
হঠাৎ গাছের উপুর

জানাও প্রাণের সোহাগ্—
কোয়াক্ কোয়াক্ কোয়াক্।

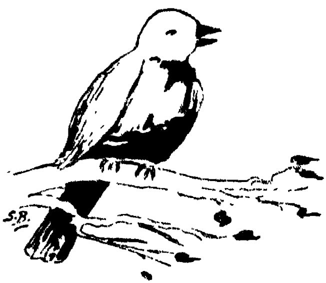
ভারী সুন্দর এই ঘুঘুর ডাক্‌টা। সুরে প্রাণ উদাস করে' ছায়। ঐ কান পেতে শোনো—দূরের ঝোপ্‌টাতে এক টানা সুরে ডেকে যাচ্ছে বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই—"ঘুঘু-ঘু"; এমন একটা ডাক ছন্দে ধরব না!—

ঘুঘু—ঘু
ঘুঘু—ঘু
ঘুঘু—ঘু
সারা—ভূ
শুধু—যে

ছন্দের টুং টাং

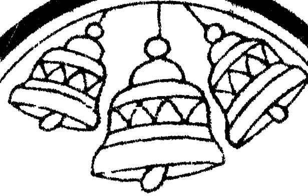
ধুধ্—রে

উলু—লু



ঘুঘু—ঘু।

ঘোষেদের ছোট মেয়ে মালতী তার সই টেঁপীর বাড়ী চলেছে পুতুল খেল্‌তে। পায়ের ঘুমুর বেশ মিঠে বাজ্‌ছে কিন্তু। ছন্দে ধরব না কি?



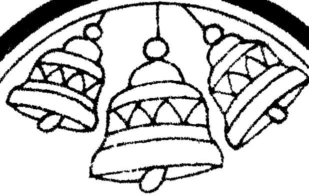
ছন্দের টুং টাং

ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুর
ঝুম্ ঝুম্—ঝুমুর
বাজ্ বাজ্—ঘুমুর !
ওই তান্—মধুর
শোন্ শোন্—অদূর ;
পায় পায়—খুকুর
বাজ্ সাঁঝ্—দুপুর ।

বেলা পড়ে এসেছে,—দূর দিগন্তে দিনের চিতা জ্বলে উঠলো, ওপারের শালবন হয়ে এলো ঝাপসা,—সন্ধ্যা নামে নামে। আজ এই সন্ধ্যার অন্ধকারে ছন্দের খেই হারিয়ে ফেল্লাম, তাই এই প্রবন্ধ এই খানেই শেষ করতে বাধ্য ।

সাঁওতালি ছন্দ

সাধারণতঃ কোনো নোংরা লোক চোখে পড়লেই আমরা নাক সিঁটকিয়ে বলি—লোকটা একেবারে "বুনো।" কিন্তু আসল বুনো বল্‌তে আমরা যাদের বুঝি তাদের মধ্যে অনেকেই যে একেবারে নোংরা ও অসভ্য নয়, তা সাঁওতালদের দেখলেই বেশ বোঝা যায়! খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এরা। বাড়ীঘরগুলি ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ কর্‌ছে। এক একটি গ্রাম যেন এক একটি ছবি! নীল পাহাড়ের নীচে—নিবিড় জঙ্গলের মাঝে, প্রকৃতি-মায়ের কোলে এরা মনের শান্তিতে দিনের পর দিন কাটায়।



ছন্দের টুং টাং

এদের আচার-ব্যবহারের কথা এখানে বলব না,—আজ এদের কয়েকটি ছড়া আর ছন্দ তোমাদের শোনাব। ছড়াগুলি অবশ্য আমি একেবারে বাংলা করে নিয়েছি—কারণ এদের ভাষা বোঝার সাধ্যি হয় ত তোমাদের নেই। তবে এই বাংলা ছড়া থেকেই তোমরা বেশ বুঝতে পারবে, আমাদের মতোই এদের কল্পনা কত সুন্দর, কত ভাব মাখানো।

চাঁদ উঠেছে,—বুড়ি দিদিমা তার আদরের নাতিটিকে হাঁটুতে বসিয়ে দোল্ খাওয়াচ্ছে আর সুর করে বল্‌ছে—

আমার নাতি—
রাতের বাতি—
চাঁদের সাথী টু—

ছন্দের টুং টাং

খোকন দাদা—
ছাইয়ের গাদা
আর ছোঁবনা থু ।



মা ছেলেকে আদর করে বল্‌লে—
খোকা মোদের দারোয়ান,
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,
না—না, খোকা পালোয়ান্‌
পীতম্‌ মাঝির ব্যাটা—
খোকার ভয়ে কাবু হবে যত বাঁদর ঠ্যাটা ।

ছন্দের টুং টাং

ছেলে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মা গান করে—

ঘুমো রে ঘুমো রে—খো-কা
আস্‌বে ভূতেরা—বো-কা।
আস্‌বে পরীরা—নে-মে!
মরবি ভয়েতে—ঘে-মে!

ডাল্‌পালা কাঁপিয়ে, শুক্‌নো পাতা ঝরিয়ে, ঝড় হু-হু শব্দে তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে ছুটে আসে, তখন ওরা গান করে—

ঝড় আসে শালের বনে,
ঝড় আসে বাদল সনে,
ঝড় আসে পলে পলে—
ঘর আসে মাঝির দলে।—

মাঝি মানে নৌকোর মাঝি নয়। এদের

ছন্দের টুং টাং

পুরুষদের মাঝি বলে।

ওদের মহুয়া কুড়াবার গান—

পাগ্‌লা ঝড়ে মহুয়া পড়ে
আয় কুড়াতে যাই—
মাঝি গেছে কর্‌তে শিকার
ভাব্‌না কেন ছাই!

বৃষ্টির দিনের ছড়া—

আয় আয় মেঘ-দেবতা
মহুয়া দেব খেতে,
আয় আয় বৃষ্টি জোরে,
আয় রে দিনে রেতে।

শীত-কালে সন্ধ্যা বেলা—আগুন জ্বেলে চারপাশে এসে বাড়ীর ছেলেমেয়ে সব জড় হয়—গল্প করে আর মধ্যে মধ্যে গান ধরে—

ছন্দের টুং টাং

শীত শীত—বইছে হাওয়া কন্‌কনিয়ে রে,



কর্‌তে গরম জ্বল্‌ছে আগুন গন্‌গনিয়ে রে!

হয়তো আকাশ-পথে এক ঝাঁক বক উড়ে গেল। একদল ছেলেমেয়ে হাত্‌তালি দিয়ে বলে উঠ্‌লো—

বগামামা বগামামা উড়ে যাবার দাম দে।
বেশী কিছু চাই না মামা চীনিয়া-বাদাম দে!

ছন্দের টুং টাং

চর্‌কা ঘুরুতে ঘুরুতে পাড়ার মেয়েরা ছড়া বল্‌ছে—

চর্‌কা কাটি সবাই মিলে
স্মুতো বেরোয় চটক্‌দার,
সবার চেয়ে ভালো স্মুতো
শাশুড়ী আর মাঐমা'র।
ঠান্‌দি' বসে' সঙ্গোপনে
কাটছে স্মুতো আপন মনে,
অবাক্ কাণ্ড, তার সে স্মুতো
সবার চেয়ে চমৎকার!

আমাদের দেশের মতো ওদের দেশেও অনেক এমন ছড়া আছে—যার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু; কিন্তু তাদের স্মুন্দর ছন্দের রেশে এমন একটা মাদকতা আছে,

ছন্দের টুং টাং

যাতে গানগুলি শুন্‌লে আর ভোলা কঠিন
হয়ে ওঠে—মানে তার থাক্‌ বা না থাক্‌!
—যেমন ওদের ছাতা-উৎসবের গান—

হলুদ-পাতায় ছেয়ে গেছে সকল জলা-ভূমি,
উপর তলায় থাকি আমি, নীচের তলায় তুমি!
তোমার ঘরে উচ্ছে ফলে, ফুল ফুটেছে তারি;
পাহাড়-তলীর বিজন পথে চল্‌বে আমার গাড়ী।

কিম্বা—

ধেনো রং ধানী,
শ্যাওলা ঢাকা পানি,
কেয়া পাতার সং—
দেখ্‌বি যদি আয়রে তোরা
কেয়া মজার ঢং।

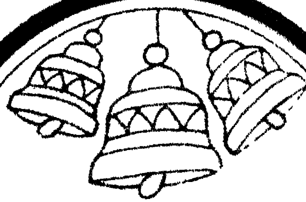
ছন্দের টুং টাং

এগুলি হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে Nonsense Rhyme—

আমরা যেমন চড়ুইভাতি করি, ওরাও তেমনি আমোদ করে' করে ফুসেলা। নিজেরা জঙ্গলে রান্নাবান্না করে খায়। ওদের চড়ুই ভাতির ছড়া হচ্ছে—

আটার-রুটী নাই পেলাম
ভুট্টা-দানা না-ই খেলাম—
চাইনা মোরা পিঠা রে—
চড়ুই ভাতি মিঠা রে!—

একটা খেলার ছড়া।—এ খেলাটা অনেকটা আমাদের আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম্ খেলার মতো—ঘরে বসে' খেলে।



ছন্দের টুং টাং

—"দাদা, মহিষ কিন্‌বি ভাই ?"—
"মোষ দিয়ে কি করব ছাই ?"
—"করব মোরা মোষের গাড়ী
যাবো চলে শ্বশুরবাড়ী ?"—

একদিন আমি সাঁওতালদের গ্রামে বেড়াতে গেছিলাম। আমাকে দেখে একদল ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে কাঠি বাজিয়ে গান্ করতে লাগ্‌লো—

দে বাবু পয়সা কড়ি—
সবাই মিলে ক্ষুধায় মরি।
দে বাবু পয়সা-কড়ি—
সবাই মিলে পায়ে ধরি।—ইত্যাদি।

এমন অবস্থায় পয়সা না দিয়ে কে থাক্‌তে পারে বলো!

ছন্দ-হিল্লোল

উজিয়ে চলেছি বর্ষার ভরা গাঙ্ বেয়ে।
ও পারে বন্‌তরাইয়ের নিবিড় গজারি-বন



আর বুনো বোয়ানের ঝোপ্ ভালো দেখা
যায় না; শুধু মহাকালের শাদা মন্দিরের

ছন্দের টুং টাং

চূড়োর চক্‌চকে ত্রিশূল্‌টা ঝলমলে আলোয় ঝক্‌মক্‌ করছে! এ পারের গ্রামের স্বপ্নটা সত্যি হয়ে চোখের সাম্‌নে ধরা দিল—গাছে গাছে মালতীলতার বেড়, বুঝি মধু-মালতীর দেশ।

চেয়ে দেখি অদূরে ভাঙ্গা ঘাটের শ্যাওলা-পড়া পৈঠা বেয়ে "দুইটি মেয়ে নাইতে নেমেছে"—কিন্তু ভালো করে' ঘুরে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম্‌—কোথাও "নোটন নোটন পায়রা-গুলি ঝোঁটন্‌ বাঁধেনি"।

নৌকার নীচে অথই জল অবিরাম গান গেয়ে চলেছে—"ছলাৎ ছল্‌—ছলাৎ ছল্‌।"

"ছলাৎ ছল্‌—ছলাৎ ছল্‌,
অধীর আজ নদীর জল্‌।

ছন্দের টুং টাং

শোনায় গান্ জুড়ায় প্রাণ্
পরাণ্ মোর সুচঞ্চল্ !
বিজন তীর নিজন, থির—
কূজন-হীন্ কানন্ তল্ ;
ছলাৎ ছল্ ছলাৎ ছল্ !"…

এগিয়ে চলেছি !…

গাঁয়ের পাশ ঘেঁষে একটা খাল এসে নদীতে পড়েছে ! উঁচু ঢিবির আড়ে তার ক্ষীণ ধারা দেখা গেল । একটা প্রাচীন বট গাছ দাঁড়িয়ে কতকাল ধরে' তার লেখা জোখা নেই । ঝুরির পর ঝুরি নেমেছে মাটির দিকে —তার তলে বসে এক বুড়ী—হয়ত আন্ধি-কালের বন্ধি বুড়ী ! পাড়ার কতগুলি দুষ্টু, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তার নামে ছড়া কেটে

বিরক্ত কর্‌ছে !

"ও বুড়ি তোর কয়টি ছানা ?" বুড়ী রেগেই কাঁই। হাতের লাঠি দিয়ে "হেঁই" বলে মুখ খিঁচিয়ে মাটিতে এক আছাড় মারে, —ছেলেমেয়েগুলি ভয়ে ছুটে পালায় ! আবার বলে—

"ও বুড়ী তোর কয়টি ছানা ?
ও কিরে তোর চোখ্‌টি কানা !!

বুড়ী পাশের গোবরের ঝাঁকাটি তুলে চলে যায়,—ছেলেগুলি পিছন নেয়—"বুড়ী, বুড়ী, তোর কয়টি ছানা ?"—

একটা টিলায় বসে' গাঁয়ের ছেলে চার ফেলেছে মাছের আশায়। পাশে একটি ছোট মেয়ে—বোধ হয় তার বোন্—আলু-

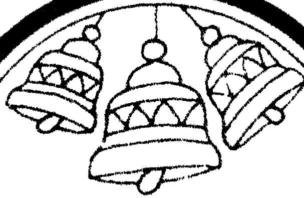
ছন্দের টুং টাং

থালু চুলে একটা ধামা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাদার মাছ ধরবার কসরৎ দেখ্ছে! নৌকার শব্দে মেয়েটি ডাগর চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকালো!···

বেলা পড়ে আস্ছে!—"ও মাঝি আর কতদূর?—"

মাঝি উত্তর দিলে,—"আর তিন্ বাঁক্ বাবু—হৈ আঠার বাঁকীর তীরে, সন্ধ্যার আগ্নাগাদ্ পৌঁছাব।"···

"ক্যাঁচর্ কুর্ কুর্"—মাথার উপর দিয়ে একটা পাখী উড়ে গেল নাম জানি না, ধাম জানি না। দিগ্দিগন্ত সেই শব্দে যেন মুখরিত হয়ে উঠ্ছে। "ক্যাঁচর্ কুর্ কুর্—।"



ছন্দের টুং টাং

“ক্যাঁচর্ কুর্ কুর্—
ক্যাঁচর্ কুর্ কুর্—”
বাতাস্ ফুর্ ফুর্
উড়ায় মন্ মোর
অনেক দূর্ দূর্।
কোথায় যাই ভাই
কিছুই ঠিক নাই ;
দূরের বন্ গাঁয়
পাতার ঝুর্ ঝুর্।
পাখীর গান্ শোন—
ক্যাঁচর্ কুর্ কুর্!

সূর্যিমামা পশ্চিমে হেলে পড়েছেন। সমস্ত আকাশটা পাড়ি দিয়ে তাঁর মুখ্‌খানা পরিশ্রমে লাল্ টুক্‌টুক্! পূবে ঝাপ্‌সা ধোঁয়া

ছন্দের টুং টাং

ঘনিয়ে আস্‌ছে। কোন্ বাড়ী থেকে মা ছেলেকে আকুল হয়ে ডাক্‌ছেন—"তিতু ঘরে আয়রে!"

"তিতু ঘরে আয় রে—"
ডাকে মাতা তায় রে,—
ডেকে গলা ভাঙ্গলো
কোথা তিতু হায় রে!
তিতু গেছে বাইরে
কোথা ভাবি তাই রে!
মা যে ডেকে হয়রাণ্,
ভেবে ভেবে ভয় পান্!
সাঁঝে ছায়া ছায় রে
তিতু ঘরে আয় রে!···

কিন্তু তিতুর আর সাড়া শব্দ নেই। কোথায় গেছে কাঁকড়া ধরতে, গাছে চড়তে কি ছিপ্ বাইতে কে জানে! শূন্য মাঠে মায়ের প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আস্তে লাগ্‌লো।

পাড়ার মেয়ে-বৌ ঘাটে আস্‌ছে জল নিতে। কাঁখে কলস, অলস গতি। কারুর বা পায়ের মল বাজছে—"ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিন্—"

ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিন্
ফুরায় ক্ষীণ্ দিন্!
গাঁয়ের বৌ যায়
ঘাটের দিক্-টায়,—

বাজায় জোর্ জোর্
পায়ের মল্-বীন্।



ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিন্।

ওদিক থেকে ঘাসে বোঝাই এক ছিপ্ নৌকা তর্ তর্ করে' পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেক দূর থেকেও মাঝির মাণিক্-

ছন্দের টুং টাং

পীরের গান শুন্‌তে পাচ্ছিলাম।

"ভব নদীর পারে যাবার লা—"

ফির্‌তি পথে রাখাল ছেলের মেঠো বাঁশী মন্‌ উদাস কবে' বেজে চলেছে। সঙ্গে গরু-ছাগলের পাল। অস্ত রবির লাল আলো তাদের গায়ে পিঠে পড়েছে। চমৎকার গোধূলী-সন্ধ্যা! ঐ কল্‌মীর ঘন ঝাড় ঘেঁষে পান্‌কৌড়ি ডুব দিল। খুব চালাক ওরা! কোথায় ডোবে কোথায় ওঠে বলা মুস্কিল্‌!

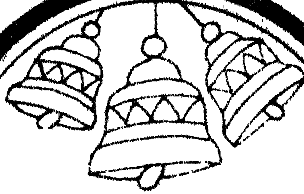
পান্‌ কৌড়ি
পান্‌ কৌড়ি,
ড্যাখ্‌ পট্‌লা
ড্যাখ্‌ গৌরী!

ছন্দের টুং টাং

ওই ডুব্‌ল
খুব চুব্‌ল—
ফের উঠ্‌ল,
যায় দৌড়ি’!

পলাশ-তলার নীচে বুনো ঘেঁটুর গাছ।
জল-পায়রা নাচ্‌ছে—থৈ তাতা থৈ!

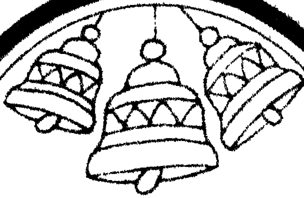
থৈ তাতা থৈ—
নাচ্‌ দেখ ঐ
জল্‌ পারাবত
যায় উড়ে কৈ?
কৈ কোঁথা যায়—
আয় তোরা আয়
নাচ্‌ দেখে রই—
থৈ তাতা থৈ!



ছন্দের টুং টাং

মাঝির লগিতে জল্-পট্পটি ঘাস আট্কাচ্ছে। জল খুব কম। প্রায় ডাঙ্গা ঘেঁষে চলেছি। এ পারে ঘুম্নগরের বাথান্—ওপারে বনে ঢাকা মাসী-পিসীর দেশ। শোনা যায় নিশুত্রাতে বন্গাঁবাসী মাসী-পিসী উড়্কী ধানের মুড়্কী আর আমন-চিঁড়ের মোআ ছেলেদের বিলোতে বসেন! ছেলেরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাই খায় আর হাসে—যেমন হাসে বুড়ীমায়ের আদর পেয়ে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ্টা!

এক ঝাঁক বাদুড় এক ডাল থেকে আর এক ডালে বসে। এখানে আদুরে ছেলেদের ভাগ্যে আর পেয়ারা খাওয়া ঘটে না বোধহয়, কারণ ছোটবেলায় ঠান্দির মুখে শুনেছি,



ছন্দের টুং টাং

"আত্নরের পেয়ারাটি বাত্নড়ে খায়।"—তা কি আর মিথ্যা হবার জো আছে, বাপ্‌রে!

জিওল গাছটার ফাঁকে দেখা যায় এঁকা বেঁকা ছোট রাস্তাটি ঘুরে ঘুরে দূরে চলে গেছে গ্রাম পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, হাট ছাড়িয়ে অজাস্তিপুরের দিকে। পথিক চল্‌তে গিয়ে খানিক বিশ্রাম করে' নেয় গাছটার নীচে, পোঁট্‌লা খুলে চিঁড়ে গুড় খেয়ে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সবুজ মখ্‌মলের মত ঘাসের উপর। মনে পড়ে তার ঘরের কথা। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েকে দেখে মনে পড়ে যায় নিজের ত্নলাল-দের কথা। হন্‌হনিয়ে পথ হাঁটে ফের।

নেড়া বেল্‌গাছটায় ব্রহ্মদৈত্যির ভয়। মাঝি "রাম রাম" করে উঠ্‌ল। অনেক দূর

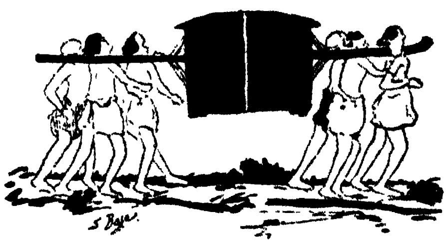
ছন্দের টুং টাং

দিয়ে ডুলি চলেছে। নতুন-বৌ চলেছে বোধ হয় শ্বশুর বাড়ী! বেহারাদের হুম্‌কী কাণে এসে বাজ্‌ছে!

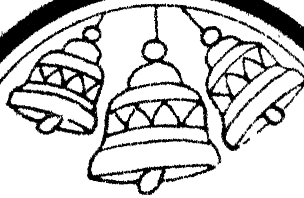
হুলি' হুলি'
চলে ডুলি।
আঁকা বাঁকা
বনে ঢাকা
ছোট পথে
কোন মতে
চলে ছুটে
চারি মুটে।
নাহি বুঝি
সোজা সুজি
বলে বুলি;
চলে ডুলি।

ছন্দের টুং টাং

চলে মেয়ে,
আঁখি বেয়ে



ঝরে ধারা,
আহা সারা
কেঁদে বুঝি,
মাথা গুঁজি।



ছন্দের টুং টাং

বাড়ী ছেড়ে
চলেছে রে
স্বামী ঘরে,
আহা ঝরে
ছুটি আঁখি
থাকি থাকি ॥

পড়ে মনে
গৃহ-কোণে
জননীকে
অনিমিখে,
মনে আসে
চোখে ভাসে ।
ডুলি থেকে
বেঁকে বেঁকে

ছন্দের টুং টাং

ডুরি দারী
রাঙা সাড়ী
পড়ে ঝুলি',
চলে ডুলি।

ডোবে রবি
ঢাকে সবি
আঁধারেতে ;
পাশে ক্ষেতে
ওঠে মেতে
মৃদু হাওয়া।

ঘাসে ছাওয়া
উঁচু মাঠে,
নীচু বাটে,

ছন্দের টুং টাং

নীচু আলে,
চলে তালে
"বাহী" গুলি,
চলে ডুলি।
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে
শাখে শাখে,
পাখী ফিরে
নিজ নীড়ে
নভঃ বাহি,
গীতি গাহি'
'কল' তুলি।
চলে ডুলি।
ওঠে চাঁদা
লাগে ধাঁধা

ছন্দের টুং টাং

আলো জাগে
ভালো লাগে,
ঝিলি মিলি
নিরিবিলি
বনে বনে,
কোণে কোণে,
নেশা লাগে,
অনুরাগে
সবি ভুলি—
চলে ডুলি।

চলে মেয়ে
স্বামী গেহে
কোথা যাবে
শুধু ভাবে,

ছন্দের টুং টাং

জানে না সে
শুধু ভাসে
আঁখি জলে,
তবু চলে।
থাকি থাকি
মুদে আঁখি
পড়ে ঢুলি';
চলে ডুলি।

ঐ আঁঠার-বাঁকীর মোড়। জোড়া মৌ-তলায় সাঁঝ্-পুজুনীর ঘণ্টা বেজে উঠেছে। তুলসী তলায় দুগ্‌গো পীদ্দিম্ দেওয়া সেরে বৌ-ঝি শাঁকে ফুঁ দিল।

আমার পথ শেষ।

বিদেশী ছড়া

আমাদের দেশে ছড়ার তো ছড়াছড়ি। ঘুম্-পাড়ানী ছড়া, ছেলে-ভুলানো ছড়া, খেলা-ধূলার ছড়া, ব্রত-পার্ব্বণের ছড়া—আরো কত যে ছড়া আছে, তার আর শেষ নাই। সেই ছেলে বেলায় মা দিদিমার মুখে যে সব মিষ্টি ছড়া শুনেছি—এখনো যেন তা মধুর মত কাণে লেগে আছে,—প্রাণে বেজে আছে। সে সব ছড়া শুন্‌তে শুনতে কখনো মন উধাও হয়ে ছুটে চলে যেত সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে কোন্ এক কঙ্কাবতী রাজকন্যার দেশে,—

ছন্দের টুং টাং

কখনো চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ত তেপান্তরের সীমাহীন ধূ-ধূ মাঠ—রাজপুত্তুর ঘোড়ায় চ'ড়ে টগ্‌বগিয়ে ছুটে চলেছেন, গজ-মোতির মালা তাঁর বুকে দুল্‌ছে—কখনো ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর ডাক স্পষ্ট যেন কাণে শুন্‌তে পেতাম। মনে হয় আবার সেই অতীত ছেলেবেলার যুগে ফিরে যাই—আবার সেই মায়ের মুখের মিষ্টি সুরের মধুর ছড়া শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ি—আবার সেই সব আজব রঙীন্ কল্পনায় বুঁদ্ হ'য়ে থাকি। কিন্তু দুঃখ ক'রে আর কি হবে, তা' তো আর হবার নয়!

অর্থ খুঁজ্‌তে গেলে হয়তো অনেক ছড়ার কোন যুক্তিপূর্ণ মানেই খুঁজে পাওয়া যাবে না—কিন্তু তাদের প্রতি ছত্রে যেন স্বর্গের অমৃত

ঝরে' পড়ছে। বাংলার বাইরে আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি, নানান্ জায়গার ছড়া শুনে আমার ধারণা হয়েছে—কি ভাবে, কি মাধুর্য্যে, কি সুরের মিষ্টতায়, বাংলার ছড়ার থেকে তারা কিছু মাত্র কম নয়। আমি কয়েকটি সাঁওতালী ও বিহারী ছড়ার বাংলা ভাবানুবাদ করেছিলাম। শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এ-বিষয় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন।

আজ তোমাদের কয়েকটি বিদেশী (ইয়োরোপীয়) ছড়ার নমুনা উপহার দিলাম। কবিতাগুলি কিন্তু ঠিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। সম্পূর্ণ বাংলা ছাঁদে গড়লেও মূল ভাব বজায় আছে। এ সব ছড়াগুলি

কিন্তু অর্থহীন নয়। ওদের দেশে এগুলিকে বলে 'Nursery Rhyme'। মায়েরা ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম্ পাড়াতে সুর ক'রে এ সব গান করেন,—ঠাকুর্দ্দারা নাতি-নাতিনীদের নিয়ে এসব ছড়া কেটে রসিকতা করেন। এগুলি ওদের দেশে খুব চল্‌তি।

এক বুড়ীর গল্প শোন :—

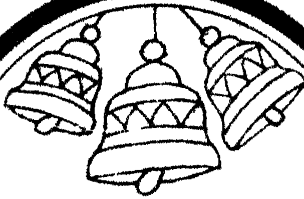
এক যে ছিল বুড়ি,
খুব ছিল থুথ্‌থুরি,
তার ছিল তিন ছেলে
হিরু, বীরু, ধীরু,—
হিরু গেল কাশীতে, মর্‌ল সেথা ফাঁসিতে
বীরু গেল পুকুরে, মর্‌ল ডুবে দুপুরে ;
বন জঙ্গল ছাড়িয়ে ধীরু গেল হারিয়ে।

ছন্দের টুং টাং

বাড়লো বুড়ীর শোক :
ঝাপ্সা হোলো চোখ্,



তিন ছেলে আর রইল না তার
হিরু, বীরু, ধীরু ॥



ছন্দের টুং টাং

আহা, বুড়ীর দুঃখে অতি পাষণ্ডের চোখেও জল আসে। এইবার শোনো কালা-বুড়োর কথা :—

খোকা—বুড়ো বুড়ো তুমি আমায়
পয়সা দেবে ধার !
বুড়ো—কি বল্ছ, বুঝ্ছি না ছাই—
কাণ কালা আমার।
খোকা—বুড়ো বুড়ো—আমার বাড়ী
তোমার নিমন্ত্রণ।
বুড়ো—হ্যা হ্যা হ্যা চল্ চল্,
সোণার যাদু-ধন।

কেমন মজার কালা বলতো ?

পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাট্তে চলেছে, ছোট খুকুরও হয়েছে তাই সাধ।

মার হুকুম ছাড়া তো তার যাবার উপায় নেই। মাও তাকে দুঃখ দিতে রাজী ন'ন।

"মাগো আমি সাঁতার কাটি গিয়ে ?
তুমি কিছু মনে ভেবো না !"
"যাও গো বাছা জুতো মোজা খুলে,
খুব হুঁসিয়ার, জলে নেবো না।"

গাছের উপর সবুজ টিয়ে দেখে খোকা ছুঁড়ে মেরেছে তার দিকে এয়া এক ঢিল। কিন্তু খোকার হাতের টিপ কেমন তা সে নিজেই তোমাদের বলছে—

"গাছের উপর সবুজ টিয়ে,
তাক্ করেছি তাকে,—

ফস্‌কে গিয়ে ঢিল্‌টি লাগে
ঠাকুর্দ্দাদার টাকে।”



এইবার শোনো এক আশ্চর্য্য ঘটনা—
দেখে এসো ও-পাড়ায় তিন মেয়ে থাকে
কাণ দিয়ে শোনে তাই,
মুখে কথা বলে, ভাই
হাস্‌ছ কি,—নিশ্বাস নেয় তারা নাকে।”



ছন্দের টুং টাং

কেমন মজার নয়! তোমাদের ভিতর এ রকম অদ্ভুত মেয়ে কেউ আছ নাকি! এইবার জোর ক'রে গল্প বলার ধরণ শোনো ঃ—

"গল্প বলি, গল্প বলি—
তোমরা শোনো মন দিয়ে,
একি, কোথায় পালাও বাপু,
না শোন্‌বার ফন্দি এ।
শোনো,—ছিল একটি মেয়ে,
একটি ছেলে দুরন্ত,
তাদের ছিল মেনী বেড়াল,
একটা পাখী উড়ন্ত।
এই মরেছে,—যেই করেছি
গল্প সুরু, অম্‌নি ভাই,

গল্পটা ছাই ঘুলিয়ে গেল,
কাজেই এখন বিদায় চাই।"

আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও আজ তোমাদের কাছ থেকে বিদায় চাইছি।

মিল ও ছন্দ

কবিতা লিখ্‌তে যেমন ছন্দের দরকার, মিলের দরকার ঠিক ততখানিই। খুব সুন্দর ছন্দের আর গভীর ভাবের কবিতাতে যদি মিলের দোষ থাকে তবে তা ঠুঁটো-কার্ত্তিকের মতোই অশোভন হবে। খারাপ মিলের সুছন্দ-কবিতা ঠিক পরমা-সুন্দরী রাজকুমারী —যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চল্‌ছেন, সুরূপা নর্ত্তকীর অপরূপ নাচে যেন নূপুর ঠিক মতো বাজ্‌ছে না। কাজে কাজেই ভালো কবিতার প্রধান অঙ্গ যেমন ছন্দ, তেমনি ভালো মিলও অবশ্য

দরকার। ওস্তাদের বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে পাখোয়াজের বোল্ ঠিক সমান তালেই চলা দরকার, না হলে রসিক শ্রোতা সভা ছেড়ে চলে আস্‌বেন।

এখন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—ভালো 'মিল' কাকে বলে! দুই একটা উদাহরণ দিলেই তোমরা কিছুটা বুঝ্‌তে পারবে হয় তো। দুই একজন প্রাচীন গ্রাম্য কবির কবিতা দিয়ে দৃষ্টান্ত দেই :—

"শীতে ভাজি মুড়ি খই,
গম্মি-কালে ঘোল মই,
বার মাস ভিয়াই সন্দেশে.
খাইতে ভোলার গোল্লা
ফিরিঙ্গী এণ্টনী মোল্লা

হল্লা করে' তাল্লা দিয়ে বসে।"

এখানে "খই" "মই" আর "গোল্লা" "মোল্লা"র মিল বেশ ভালো হয়েছে। কিন্তু "সন্দেশে" আর "বসে" এই দুটো শব্দের 'মিল' হলেও ভালো 'মিল' হয় নি কিছুতেই। "সন্দেশে"র "দেশে"র সঙ্গে "বসে" কথাটার মিল না হ'য়ে "এসে" "শেষে" "হেসে" এই রকম কিছু মিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ "সন্দেশে" কথাটার মধ্যে আমরা মিল পাচ্ছি 'এশে' (সন্দ্ + এশে) আর 'বসে' কথাটাতে পাচ্ছি 'অসে' (ব্ + অসে), কাজে কাজেই "এশে"র সঙ্গে "অসে"র মিল কোনো রকমেই যুক্তি-যুক্ত নয়। আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্ :—

ছন্দের টুং টাং

"ত্রিভঙ্গ হইয়ে বাঁশীটি বাজায়ে
বসিয়া কদম্ব-মূলে—
রাধা রাধা বলে' ডাকিতে ডাকিতে
আসিব যমুনা-জলে।"

এখানেও আমরা "মূলে"র সঙ্গে "জলে"র মিল পাচ্ছি। প্রাচীন কবিটির যদি ভালো মিল-জ্ঞান থাক্‌তো তবে তিনি "মূলে"র সঙ্গে অনায়াসেই এখানে "কূলে" কথাটা বসিয়ে মিল বজায় রাখ্‌তে পার্‌তেন।

আজকালকার ভালো লেখকদের কবিতায় তোমরা রাশি রাশি ভালো 'মিল' দেখ্‌তে পাবে। যিনি ছন্দ আর ভাব বজায় রেখে মিলের যত বাহাদুরী দেখাতে পারেন—তিনি রসিক সমাজে হাততালি পান তত বেশী।

ছন্দের টুং টাং

অনেক ছেলেমেয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছে —কবিতা লিখ্‌তে অক্ষর গুন্‌তে হয় নাকি! তার উত্তরে আমি বলি—কবিদের অক্ষর গুন্‌তে হয় না। জ্যোৎস্না যেমন চাঁদ চুঁয়ে নেমে আসে,—কবিতাও তেমনি কবির ভাবুক-হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে অমিয়-নির্ঝরের মত —পাখীর সহজ গানের মত। ছন্দ মিল তাকে আপনি ধরা দেয়। ছন্দ ঠিক রাখ্‌তে কাণের দরকার সবচেয়ে বেশী।

ছন্দ ঠিক হলেই অক্ষরও ঠিক হয়। তবে ঠিক আঠারো অক্ষরের নীচে ঠিক আঠারো অক্ষরই যে বস্‌বে তার কোনো মানে নেই। বইখানির প্রথম প্রবন্ধের থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌ :—

পুরী মিঠাই
ভাবেন্ কি ছাই,—

এখানে "পুরী মিঠাই" পাঁচ অক্ষর; আর "ভাবেন্ কি ছাই" ছয় অক্ষর। তাতে ছন্দের কোনো গোলযোগ হয় নি। কারণ "ন" এ হসন্ত আছে বলে "ন"টা পুরোপুরি উচ্চারণ হচ্ছে না—সামান্য একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। কিন্তু "ন" অক্ষরটা যদি ওখানে পূর্ণ উচ্চারণ হোত তা হলেই ছন্দের গোলমাল্ বেধে যেত। সাঁওতালী ছন্দের একটা উদাহরণ :—

আটার রুটী নাই পেলাম
ভুট্টাদানা নাই খেলাম— !

উপরে আছে দশ অক্ষর, নীচে আছে নয়

অক্ষর। কিন্তু ছন্দ পতন হয় নি। "ভুট্টা" কথাটা হচ্ছে "ভুট্-টা"।

অক্ষব নিয়ে সব সময় মারামারি করলে চলে না। বড় বড় নাম-জাদা কবিদের এমন লেখা তোমরা আজকাল ঢের পাবে যার প্রথম লাইনে হয়তো দুই অক্ষর, তার নীচেই হয়তো বত্রিশ অক্ষর, আবার তার নীচে দশ অক্ষর—এই রকম স্বেচ্ছাচারিতা অথচ ছন্দ-পতন হয় নি। কারণ ওগুলি "অ-সম" ছন্দ। এরকম ছন্দের নমুনা তোমরা আজকালকার কাগজে ঢের পাবে, তাই আর তার নমুনা এখানে দিলাম না।

অনেক বিদেশী ছন্দ আজকাল বাংলা-সাহিত্যকে সম্পদশালী করেছে। এইসব

ছন্দের টুং টাং

ছন্দকে নিজের করে' নেওয়ায় এক দিকে যেমন আনন্দ আর অন্যদিকে তেমনি গৌরব। অবশ্য এই নিজের করে' নেওয়াটাতে খুব বড় ওস্তাদের হাত দরকার। খুব পাকা ওস্তাদের হাতেই বিদেশী ময়ূর নাচ্‌তে পারে, বিদেশী বুল্‌বুল্ গান গাইতে পারে।

বিদেশী ছন্দের উদাহরণ কয়েকটা আমি আগেই দিয়েছি; এখানেও আর দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি। ইংরাজী ঘুম-পাড়ানী ছন্দের একটা নমুনা দেখ :—

"Hush a—bye, ba-by,
on the tree-top"

আস্তে— ভাই, খু-কু, ওই যে ঘুম্ যায়
উচ্চ— গাছ্, তা-তে দোল্‌না দোল্ খায়,

ভাঙ্‌বে—ডাল, আ-হা বইলে জোর বায়,
পড়্‌বে—হায়, খু-কু, লাগ্‌বে তার গায়।

'ছন্দ-হিল্লোল' প্রবন্ধে যে "ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিন্" ছন্দটা আছে ওটা আরবী "হজ্‌য্" ছন্দের অনুরূপ।

৩ ২ ২
ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিন্
ফুরায় ক্ষীণ্ দিন্।

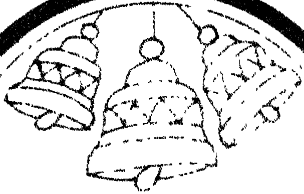
প্রতি তৃতীয় অক্ষরে, পঞ্চম অক্ষরে আর সপ্তম অক্ষরে হসন্ত পড়্‌ছে। এই হসন্তের একটু গোলযোগ হলেই 'হজ্‌যে'র আরবী নাচ থেমে যাবে। ধর এখানে যদি এরকম হয়:—

ঝিনিক্ ঝিন্ ঝিন্—
ফুরায় ছোট দিন্,—

এখানে অক্ষর ঠিক আছে, ছন্দেরও কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে "ছোট" শব্দে "ট" কথাটা পুরো উচ্চারণ হচ্ছে বলে' "হজ্য" হিসাবে ছন্দ-পতন হোলো। "ক্যাঁচর কুর্ কুর্" ছন্দটাও "হজ্য"। এখানেও ঠিক আগের নিয়মই খাটছে। ছন্দ-হিল্লোল প্রবন্ধে।—

৩ ২ ৩ ২
ছলাৎ ছল্ ছলাৎ ছল্
অধীর আজ্ নদীর জল্,—

এই কবিতাটিও আরবী ছন্দের, তবে এটাতে সংস্কৃত "ভুজঙ্গপ্রয়াত" ছন্দেরও কিছু



আভাস পাওয়া যায়। এর প্রত্যেক লাইনে তৃতীয় অক্ষর, পঞ্চম অক্ষর, অষ্টম অক্ষর আর দশম অক্ষরে হসন্ত পড়ছে। এই ছন্দের একটা নতুন উদাহরণ দিয়ে আজ তোমাদের কাছে বিদায় চাই :—

তোদের প্রাণ্ সুখের্ হোক্
নতুন গান্ মুখেই রোক্,—
নতুন গান্ নতুন প্রাণ্
দেখুক ভাই সকল লোক্।
মধুর দিন সুমঙ্গল্
কবির প্রাণ সুচঞ্চল্,—
আশিস্ তাই তোদের ভাই
জানায় আজ সুনির্ম্মল!

ছন্দের টুং টাং

কবিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু জান্‌বার আছে, তবে একসঙ্গে সব বল্‌তে গেলে তোমরা সব গোলমাল করে' ফেল্‌বে। তবে মোটামুটি এখন এইট্‌কু জান্‌লেই চল্‌বে।

শেষ